

জুলাই বিপ্লবের দুই বছর

ইমরান রহমান

দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা এবং রক্তাক্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে দেড় দশকের স্বৈরশাসনের পতন ঘটে ২০২৪ এর ৫ আগস্ট। এই যুগান্তকারী আন্দোলনে স্বৈরিণী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি এবং পেছনের দরোজা দিয়ে তার পলায়নের দৃশ্যে যেন রাজা লক্ষণ সেনের কাপুরুষোচিত ইতিহাস ফিরে আসে! পৃথিবী প্রত্যক্ষ করে মুহূর্তের মধ্যে সকল দম্ভ, ঔদ্ধত্য ধুলোয় মিশে যাওয়ার এক অনন্য নজির। এই সংকটময় মুহূর্তে সেনাবাহিনীর ভূমিকা শুধু ঐতিহাসিকই ছিল না, ছিল দৃষ্টান্তমূলকও। রাষ্ট্রক্ষমতার চূড়ান্ত বৈধতার উৎস জনগণ এবং জনগণের সমর্থন হারালে কোনো সরকারের পক্ষে শুধু রাষ্ট্রীয়স্তরের ওপর অনির্দিষ্টকাল ভর করে টিকে থাকা সম্ভব নয়—এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে সেনাবাহিনী যদি সেদিন সংযম, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় না দিত, তবে একদিকে যেমন আরও রক্তপাতের ঘটনা ঘটতে পারতো, অন্যদিকে রাষ্ট্রের যাত্রা হতে পারতো অনির্দিষ্ট এক গন্তব্যের দিকে। একজন ক্ষমতাচ্যুত অবৈধ সরকার প্রধানকে নিরাপদে দেশত্যাগের সুযোগ করে দেওয়ায় পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন মহলে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও একটি কঠিন পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক অঙ্গানে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র আন্দোলন নতুন কোনো ঘটনা নয়। ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন কিংবা সাম্প্রতিক আন্দোলন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, স্বাধীনতার আগে ও পরে এসব গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এলেও, তাদের অনেকেই এই মৌলিক সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, জনগণ যেমন কাউকে ক্ষমতায় বসাতে পারে, তেমনি প্রয়োজন হলে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েও দিতে পারে।

জুলাই এর ছাত্র-জনতার মহান বিপ্লব আবারও প্রমাণ করেছে যে, অন্যায়, বৈষম্য, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং প্রশাসনিক ও বিচারিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাহীনতা যখন দীর্ঘদিন ধরে জমা হতে থাকে, তখন কোটা আন্দোলনের মতো একটি নির্দিষ্ট ইস্যুও বৃহত্তর গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাহস, দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগ জাতিকে নতুন করে আশা দেখিয়েছে—একটি অধিকতর জবাবদিহিমূলক, ন্যায্যভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের প্রত্যাশা জাগিয়েছে। তবে এ আন্দোলনের তাৎপর্য শুধু জাতীয় ঐক্যের পুনর্জন্মেই সীমাবদ্ধ নয়; আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিসরে বাংলাদেশের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, সার্বভৌম মর্যাদা এবং কোনো ধরনের অযাচিত বিদেশি হস্তক্ষেপ মেনে না নেওয়ার প্রশ্নেও অকাটা। বিশেষ করে যে আধিপত্যবাদী প্রভুর আশীর্বাদে সেবাদাস হাসিনা সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পেরেছিল, তার বিরুদ্ধে এ আন্দোলন ছিল এক কঠোর হাশিয়ারি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, এই অভূতপূর্ব ঘটনাপ্রবাহের শিক্ষা আমাদের জাতীয় ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে কি না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনো গণঅভ্যুত্থানই কেবল সরকার পরিবর্তনের জন্য সংঘটিত হয় না; বরং তার মূল লক্ষ্য থাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শন, রাজনৈতিক আচরণ এবং ক্ষমতা প্রয়োগের সংস্কৃতির মৌলিক রূপান্তর। ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের পতন কিংবা আরব বিশ্বের গণঅভ্যুত্থান—প্রতিটি অভিজ্ঞতাই দেখিয়েছে যে, পুরোনো শাসকের পতনের পরও যদি পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ক্ষমতা পরিচালনার মানসিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে, তবে জনগণের আত্মত্যাগের কাঙ্ক্ষিত সুফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

জাতীয় পরিচয় ও রাজনৈতিক ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রেও ইতিহাসে প্রায়ই একটি অভিন্ন প্রতিপক্ষ বা common enemy গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় ঔপনিবেশিক শাসনই ছিল সেই অভিন্ন প্রতিপক্ষ, যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিস্তৃত জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। সে অর্থে জুলাই আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনার দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী শাসনও একটি অভিন্ন প্রতিপক্ষ হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রজন্মগত শক্তিকে একই প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করেছিল। কিন্তু ইতিহাস আরও শেখায়, কোনো অভিন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ঐক্য তখনই দীর্ঘস্থায়ী ও অর্থবহ হয়, যখন তা কেবল শাসক পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নতুন রাজনৈতিক মূল্যবোধ, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়। ফলে এই আন্দোলনের প্রকৃত সাফল্য নতুন কোনো ব্যক্তি

বা দলের ক্ষমতায় আরোহণে নয়; বরং রাষ্ট্র ও রাজনীতির চরিত্র কতখানি ইতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, তার ওপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনতার আগে বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্ব মূলত আন্দোলন-সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর করা সম্ভব না হলে জাতীয়তাবাদ কখনো কখনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ক্ষমতার হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে- এই সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এর কারণ স্বাধীনতার অব্যবহিত পর দুর্নীতি, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, দলীয়করণ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার যে ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, তার নেতিবাচক উত্তরাধিকার পরবর্তী দশকগুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যেই কমবেশি বহমান থেকেছে। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্র বদলালেও ক্ষমতা পরিচালনার মানসিকতা বদলায়নি। বরং একদল অন্য দলের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে একই ধরনের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা, দলীয়করণ, প্রতিহিংসা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের সংস্কৃতিকে অব্যাহত রেখেছে। জনগণের প্রত্যাশা ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েছে। জুলাই আন্দোলন সেই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত হতাশা ও বঞ্চনারই বিস্ফোরিত প্রকাশ। এই বিপ্লবের আগুনে ঘৃতাহতি ছিল ক্ষমতাসীনদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য, রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য এবং বিরোধী মতকে অবজ্ঞার সংস্কৃতি। রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থানকারীদের ভাষা ও আচরণ কেবল রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বিষয় নয়; বরং তা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতির সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, যখন ক্ষমতাসীনরা জনগণের ন্যায্য ক্ষোভকে অবজ্ঞা করে, সমালোচনাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিত্রিত করে এবং সংলাপের পরিবর্তে দমননীতিকে বেছে নেয়, তখন ক্ষুদ্র কোনো ইস্যুও বৃহত্তর রাজনৈতিক বিস্ফোরণের কারণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনেক নেতার মধ্যেই ক্ষমতায় থাকাকালে কখন কোথায় কী বলা উচিত এবং কোথায় থেমে যাওয়া প্রয়োজন—সে বোধের ঘাটতি স্পষ্ট। দায়িত্বশীল নেতৃত্বের পরিবর্তে আবেগপ্রবণ, উসকানিমূলক কিংবা অবমাননাকর ভাষার ব্যবহার ছিল শেখ হাসিনার শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদ্বেগের বিষয়, এই প্রবণতাকে অনেক সময় একশ্রেণির সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বও উৎসাহিত করেন। রাষ্ট্রক্ষমতার নিকটবর্তী থাকার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা সত্যনিষ্ঠ সমালোচনার পরিবর্তে তোষণমূলক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ক্ষমতাসীনদের ভুলকেও বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

যে সমাজে স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা ও মতপ্রকাশের পরিবর্তে আনুগত্যকে পুরস্কৃত করা হয়, সেখানে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ক্রমেই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাস বলে, কোনো জাতির অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতোই প্রয়োজন স্বাধীন সংবাদমাধ্যম, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং সমালোচনামূলক একাডেমিক পরিবেশ। কারণ গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি কেবল নির্বাচনে নয়; বরং ভিন্নমত প্রকাশের নিরাপদ পরিবেশ এবং সত্যকে নির্ভয়ে উচ্চারণ করার সংস্কৃতিতে নিহিত।

আগস্ট-পরবর্তী বাংলাদেশের সামনে তাই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন ভিত্তির ওপর পুনর্গঠন করা। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, আইনের শাসন, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা, জবাবদিহিমূলক প্রশাসন এবং সত্যভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়েই একটি স্থিতিশীল ও মর্যাদাবান রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদকে এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক চেতনায় বিকশিত করতে হবে, যার ভিত্তি হবে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা, জাতীয় স্বার্থের অগ্রাধিকার, জনগণের সম্মতি এবং বিদেশি আধিপত্য বা অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রতি সুস্পষ্ট অনাগ্রহ। তাহলেই জুলাই-আগস্টের আত্মত্যাগ কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্মারক হয়ে থাকবে না; বরং বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাসে একটি নতুন গণতান্ত্রিক যুগের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

#

লেখক: সাংবাদিক ও কবি

পিআইডি ফিচার